বাংলা সনের ইতিহাস

বাংলা সনের প্রথম দিন বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়। বাংলা নববর্ষ নিয়ে জানার আগ্রহ তৈরি হলে বাংলা সন কীভাবে আসলো সে প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। বাংলা সন কিভাবে আসলো তা নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন। **শিশির আহমেদের** প্রতিবেদন।

বঙ্গাব্দ হচ্ছে বঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত এক সৌরচান্দ্রিক বর্ষপঞ্জি। বাংলা বর্ষপঞ্জি হলো দক্ষিণ এশিয়ার বঙ্গ অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি সৌর বর্ষপঞ্জি। বর্ষপঞ্জিটির একটি সংশোধিত সংস্করণ বাংলাদেশের জাতীয় ও সরকারি বর্ষপঞ্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যে বর্ষপঞ্জিটির পূর্ববর্তী সংস্করণ অনুসরণ করা হয়। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে নববর্ষ পহেলা বৈশাখ নামে পরিচিত। বাংলা সনকে বলা হয় বাংলা বঙ্গাব্দ। এখানে একটি শূন্য বছর আছে, যা শুরু হয় ৫৯৩-৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। বঙ্গাব্দের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। কারোর মতে ৭ম শতাব্দীর হিন্দু রাজা শশাঙ্ক বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনকারী, আবার কারোর মতে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কিংবা মুঘল সম্রাট আকবর বাংলায় প্রচলিত সৌর বর্ষপঞ্জির সাথে চান্দ্র ইসলামি বর্ষপঞ্জি (হিজরি) একত্রিত করে তৈরি করেছিলেন।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হিজরি পঞ্জিকা অনুযায়ী খাজনা আদায় করা হতো। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে কৃষিকাজের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। যার ফলে কৃষকদের অসময়ে খাজনা আদায় করতে বাধ্য করা হতো। খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার ঘোষণা দেন। অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তক এটা নিয়ে। বাংলা সন নিয়ে চার ধরনের অভিমত রয়েছে। একটি হচ্ছে তিব্বতের রাজা স্রং সন (ইনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে রাজা হন এবং মধ্যভারত ও পূর্ব ভারত জয় করেন) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন, কারণ ওই সময় বাংলার উত্তরাঞ্চলের অনেকটাই তিব্বতি সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিলো। আর বাঙ্গালা শব্দটি তিব্বতি শব্দ বন্ স থেকে এসেছে, যার অর্থ ভেজা মাটি, যা আসলেই বাংলাদেশ। দ্বিতীয় অভিমত হলো, শশাঙ্ক - যিনি বাংলা অঞ্চলে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। যিনি বঙ্গাব্দ চালু করেন। তৃতীয় অভিমতে বলা হয় যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলা সনের প্রবর্তক, আর সর্বশেষ অভিমত হলো সম্রাট আকবর ছিলেন বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। কিন্তু নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও গবেষক অমর্ত্য সেন তাঁর একাধিক নিবন্ধ, বক্তৃতা ও গ্রন্থে মুঘল সম্রাট আকবরকেই বঙ্গাব্দ'র প্রবর্তক হিসেবে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। সম্রাট আকবরকে বাংলা 'সন' বা বঙ্গাব্দর উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অবশ্য কোনও দ্বিধাই নেই অমর্ত্য সেনের। 'দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান' বইতেও সে কথা পরিষ্কার লিখেছেনও তিনি। ষাটের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কারের জন্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে সভাপতি করে সরকার যে কমিটি গঠন করেছিল, তাদেরও স্পষ্ট রায় ছিল সম্রাট আকবর খ্রিষ্টীয় ১৫৮৫ সালে বঙ্গাব্দের সূচনা করেন।

সম্রাট আকবর দেশ শাসনের ২৯তম বছরে হিজরি ৯৯২ সালে তিনি পঞ্জিকা সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। সম্রাট আকবের নির্দেশে তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতুল্লাহ শিরাজী নতুন বাংলা সনের নিয়ম তৈরি করেন। ৯৯৩ হিজরির ৮ই রবিউল আউয়াল বা ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসন আহরণের বছর ৯৬৬ হিজরি বা ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর থেকে। সেসময় ৯৬৩ চন্দ্র সন কে ৯৬৩ বাংলা সৌর সনে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা বর্ষপঞ্জির যাত্রা শুরু হয়। অর্থাৎ বাংলা বছর গণনা

১ থেকে শুরু হয়নি শুরু হয়েছে ৯৬৩ থেকে। সেই হিসেবে বাংলা বর্ষপঞ্জির বয়স মাত্র ৪৬৭ বছর। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন পরবর্তীতে বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়। বঙ্গাব্দের বিকাশ এবং উন্নয়নে আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর অনেক অবদান রয়েছে। ফতুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে পারস্যে প্রচলিত সৌর বর্ষপঞ্জির অনুকরণে ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। তবে তিনি উনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহণের বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরি সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ হিজরি সালের মুহররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শকাব্দের সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর যোগাযোগ লক্ষ্য করে মেঘনাদ সাহা ভারতের বর্ষপঞ্জি শকাব্দ ধরে করার প্রস্তাব দেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম অবৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা প্রচলিত থাকায় সরকারি কাজে সমস্যায় পড়ে পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হয়। মেঘনাদ সাহাকে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়। কমিটির অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে এ সি মুখার্জি, কে কে দাফতারি, জে এস কারাডিকার, গোরক্ষ প্রসাদ, আর ভি বৈদ্য এবং এন সি লাহিড়ী অন্যতম। সারা ভারতে একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা প্রচলন করার উদ্যেশ্য সারা ভারতে প্রচলিত প্রায় ত্রিশটি পঞ্জিকা সংগ্রহ করে তাদের সংস্কার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবাবেগকেও মাথায় রেখে এটি সংস্কার করা হয়েছিল।

বাঙালি বহুভাষাবিদ ও দার্শনিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বাংলা একাডেমির ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদক। বাংলা একাডেমির পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে বাংলা পঞ্জিকা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ পায়। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার তাদের দুজনের সংস্কার মেনে নেয় এবং সেই হিসেবে বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কার করে।

বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজ কৃষিভিত্তিক। আর এ কারণেই এখানকার জনজীবন কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনাচার থেকে শুরু করে লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির মাঝে কৃষিভিত্তিক জীবনাচারেরই প্রতিফলন ঘটে। মধ্যযুগে ও এ শতাব্দীর তিরিশ চল্লিশ দশক পর্যন্ত যেসব পালা পার্বণ কেন্দ্র করে যেসব গানের আসর বসতো, যাত্রাপালার আসর বসতো গ্রামের মানুষ তা শ্রোতার আসনে বসে সারারাত জেগে উপভোগ করতো আর তাদের বঙ্গসংস্কৃতির পিপাসা মেটাত। মেলাও জমে উঠত। এসব মেলায় নকশি কাঁথা, পাটি, মাটির পুতুল, সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় সখের হাঁড়ি পাওয়া যেত। এছাড়াও মেলায় পাওয়া যেত মুড়ি-মুড়কি-বাতাসা, কাঠের ও লোহার তৈরি জিনিসপত্র। এসব মেলায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হত। এছাড়া ঈদ, মহররম, দুর্গাপূজা, রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্মীয় পর্বকে কেন্দ্র করেও জাঁকজমকপূর্ণ মেলা বসত। আর বাঙালির প্রাণের উৎসব বৈশাখী মেলা তো আছেই। বিশ্বব্যাপী বাঙালির লোকউৎসব হিসেবে বিবেচিত বাংলা নববর্ষ। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় পহেলা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব হিসেবে পালিত হয়। বাংলা নববর্ষ অতীতে ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর ও অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৭২ সাল (বাংলা ১৩৭৯ সন) পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশের জাতীয় পার্বন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ফতেউল্লাহ সিরাজির বাংলা সন প্রবর্তনের ভিত্তি ছিল হিন্দু সৌর পঞ্জিকা। সে পঞ্জিকার নাম ছিল শক বর্ষপঞ্জি বা শকাব্দ। সে পঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারো মাস অনেককাল আগে থেকে ছিল। প্রথম দিকে মাসের নাম ছিল ফারওয়ারদিন, খোরদাদ, তীর, মুরদাদ, শাহরিয়ার, আবান, আযার, দে, বাহমান ইত্যাদি। পরে নাক্ষত্রিক নিয়মে বাংলা সনের মাসগুলোর নামকরণ করা হয়। শক বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস ছিল চৈত্র মাস। ৯৬৩ হিজরিতে চন্দ্র সনের প্রথম মাস মহরম ছিল বাংলা বৈশাখ মাসে। তাই তখন থেকে বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস। বাংলা বার মাসের নাম হচ্ছে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ , ফাল্গুন ও চৈত্র। কিন্তু বাংলা সনের মাসের নাম কিভাবে নির্ধারণ করা হয়! চন্দ্রপথকে ২৭ পথে ভাগ করে রাখা হয়েছে নক্ষত্রের নাম। বাংলা ১২ মাসের নাম এসেছে মূলত ২৭টি নক্ষত্র থেকে। বিশাখা নক্ষত্রের নাম থেকে এসেছে বৈশাখ মাসের নাম। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নাম থেকে এসেছে জ্যৈষ্ঠ মাসের নাম। আষাঢ় নামটি এসেছে পূর্বষাঢ়া নক্ষত্রের নাম থেকে। শ্রবণা নক্ষত্রের নাম থেকে এসেছে বাংলা শ্রাবণ মাসের নাম। পূর্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ থেকে এসেছে ভাদ্র মাসের নাম। অশ্বিণী নক্ষত্রের নাম থেকে এসেছে আশ্বিন মাসের নাম। কৃত্তিকা থেকে এসেছে কার্তিক মাসের নাম। পুষ্যা নক্ষত্রের নামটি থেকে এসেছে পৌষ মাসের নাম। মঘা থেকে এসেছে মাঘ মাসের নাম। উত্তর ফল্গুণী, পূর্ব ফল্গুণী থেকে এসেছে ফাল্গুন মাসের নাম। চিত্রা নক্ষত্রের নাম থেকে এসেছে বাংলা বছরের শেষ মাস চৈত্র নামটি।

১৬০৮ সালে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতি ঢাকাকে যখন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন, তখন থেকেই রাজস্ব আদায় ও ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য বাংলা বছরের পহেলা বৈশাখকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন শুরু করেন। প্রথম আধুনিক নববর্ষ পালন করা হয় ১৯১৭ সালে। ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে পহেলা বৈশাখে হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা সংস্কৃতির ওপর কালো থাবা বিস্তারে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্বপাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে রমনা পার্কে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের আয়োজন করে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধিতা করায় ১৯৬৫ সালে (বাংলা ১৩৭২ সন) 'ছায়ানট' রমনার বটমূলে সর্বপ্রথম বর্ষবরণ পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো' গানের মধ্যে দিয়ে স্বাগত জানায় বৈশাখকে। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে।

বাংলা নববর্ষের এই আয়োজনের স্থানটি রমনার বটমূল হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি বটগাছ নয়, এটি মূলত অশ্বত্থ গাছ। ১৯৭২ সালের পর থেকেই এটি জাতীয় উৎসব হিসেবে স্বীকৃত হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ সারা ঢাকা শহরে মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এই শোভাযাত্রা বের হয়। ১৯৮৯ সালে সামরিক স্বৈরশাসনের হতাশার দিনগুলোতে তরুণেরা এটা শুরু করেছিল। শিক্ষার্থীরা অমঙ্গলকে দূর করার জন্য বাঙালির নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক, প্রাণীর প্রতিকৃতি ও মুখোশ নিয়ে শোভাযাত্রা করে। ২০১৬ সালে পহেলা বৈশাখ বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষাকৃত নতুন এই উৎসবটি ইউনেস্কোর অপরিমেয় বিশ্বসংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের সকালে বাদ্যযন্ত্রের তালে নানা ধরনের বাঁশ-কাগজের তৈরি ভাস্কর্য, মুখোশ হাতে বের হয় বর্ণাঢ্য এই মিছিল।

এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা ৩৫ বছরে পা দিবে।